এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

চরিত্রের সম্পদ যাঁহার আছে, তাহার অন্য সম্পদ আপনি আসে।
— শিবনাথ শাস্ত্রী

অসুখ

গণতন্ত্রে বর্ণবিদ্বেষের তিলমাত্র স্থান নেই। বস্তুত এটি এমনই একটি ব্যাধি যা যে কোনও গণতন্ত্রকেই ভিতর থেকে জীর্ণ করতে পারে। অন্য দিকে বর্ণবিদ্বেষী প্রবণতা দমনে ব্যর্থ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির বিভিন্ন মঞ্চে সমালোচিত হতে বাধ্য, শেষ পর্যন্ত যা সেই রাষ্ট্রের বৃহত্তর কূটনৈতিক পরিকল্পনা বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা প্রবল। দুর্ভাগ্যবশত ভারতে আগত আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের কেন্দ্র করে বিগত বেশ কিছুকাল এমন কিছু ঘটনা অব্যাহত, যার ফলে এই দেশ বিশ্বমঞ্চে বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিপন্ন হওয়ার মুখে। সম্প্রতি আফ্রিকান দেশগুলির ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের যৌথ মঞ্চ যে ভাবে ভারতে আফ্রিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী হামলার প্রতিবাদ জানাল তা প্রকৃতই দুশ্চিন্তাজনক। কিছু দিন আগে কঙ্গোর নাগরিক মাসোন্ডা কেটাডার দিল্লিতে হত্যার প্রেক্ষিতে আফ্রিকান দেশগুলির এই যৌথ প্রতিবাদ। একটি অটোরিক্সা ভাড়া করাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে তিন ব্যক্তি কেটাডাকে পিটিয়ে হত্যা করে। মর্মন্তুদ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য। আফ্রিকান দেশগুলির প্রতিবাদের পরে নড়ে চড়ে বসেছে সরকার। ভারতে আফ্রিকান নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিংকে। সঠিক পদক্ষেপ। ভারত সরকার যে কোনও অর্থেই বিষয়টিকে লঘু করে দেখছেনা, এই পদক্ষেপ তার প্রমাণ।

কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। বাস্তব এটাই যে বর্ণবিদ্বেষের শিকড় ভারতীয় সমাজের একাংশের কতটা গভীরে বিস্তৃত তা বিভিন্ন সময়ে উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতার নানা মন্তব্যেই প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য গোয়ার মন্ত্রী দয়ানন্দ মন্দ্রেকরের নাইজেরিয়ান নাগরিকদের ক্যানসার ব্যধির সঙ্গে তুলনা। পরে তিনি তাঁর এই উক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এই মন্তব্যটি করেছিলেন তা থেকেই বর্ণবিদ্বেষ বিষয়ে তাঁর মানসিক অবস্থান স্পষ্ট। কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এক দল আফ্রিকান নাগরিককে হেনস্থার যে অভিযোগ আপ বিধায়ক সোমনাথ ভারতীর বিরুদ্ধে উঠেছিল, প্রসঙ্গত সে ঘটনাও মনে করা যেতে পারে। এ ছাড়া ভারতীয় পুলিশ যে প্রায়শই আফ্রিকান নাগরিকদের হেনস্থার অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে অস্বীকার করে, বহু মানবাধিকার রক্ষা সংস্থাই এমন অভিযোগও তুলেছে। বিশ্বদরবারে কূটনৈতিক সমস্যার কথা বাদ দিলেও, সভ্য গণতন্ত্র হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই ভারতীয় সমাজের উচিত অবিলম্বে আত্মবীক্ষণের মাধ্যমে এই ব্যাধির উপশমের উপায় অনুসন্ধান করা।

সাথী

স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে তো বটেই, মোবাইল ফোনগুলিকে যাতে মালিক ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা সেই আদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। এক সময় টেবিলে বসানো হাতলওলা, আদ্যিকালের যন্ত্রটির ডায়াল ঘোরানোর জায়গাটিতেও তালাচাবি মারার ব্যবস্থা ছিল। সময় পাল্টেছে, মোবাইল ফোন কাগজের মতো পাতলা আকার ধারণ করেছে, তাতে চাবি ঘোরানো তালা লাগানোর কথা এমনকী ভাবাও বাড়াবাড়ি। অতএব যেমন ফোন, তার তেমনই তালার খোঁজে হন্যে হচ্ছে প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো। ব্যক্তিগত ফোন ব্যবহারের জন্য চিচিংফাঁকের ব্যক্তিগত সংস্করণ নিয়েই খুশি ছিল মানুষ, ভাবা হয়েছিল এতেই বুঝি প্রযুক্তিগত উন্নতির সবটা হাসিল হয়েছে। সম্প্রতি এ সবকে ফুৎকারে উড়িয়েছে এক অভিনব আবিষ্কার। এখন

বাম-কংগ্রেস আসন রফা পাটিগণিতেই আটকে থেকেছে, রসায়ন কাজ করেনি প্রত্যাশা অনুযায়ী

মতাদর্শেই সমস্যা, সংগঠন চাঙ্গা হবে কী করে?

জনগণের আস্থা অর্জন করার কোনও সহজ পথ নেই। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে গ্রামীণ জনসাধারণকে বামপন্থীদের সপক্ষে ফেরানো সম্ভব নয়। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অজিত নাইনান

বিধানসভার রায় দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিপুল জনগণ। সেই রায় নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ হচ্ছে। বিরোধী শিবির ভোটের পাটিগণিত মেলাতে ব্যস্ত। কিন্তু ভোটের রসায়ন ভালো না হলে কি আশানুরূপ ফল হয়? কিন্তু আশারও অনেক কথা আছে এই রায়ে। প্রথমত ২০০৬ সালে তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে যে একজোট হয়ে লড়েছিল তখন তৃণমূল ২৫৭টি আসনে লড়ে পেয়েছিল ২৬.৬৪ শতাংশ ভোট আর বিজেপি ২৯টি আসনে লড়ে পেয়েছিল ১.৯৩ শতাংশ ভোট। সব মিলিয়ে ২৮.৫ শতাংশ। তৃণমূল পেল মাত্র ৩০টি আসন ও বিজেপি পেল শূন্য। এই নির্বাচনে এখন বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও কিছু নির্দলদের যে আসন সমঝোতা হয়েছিল তাতে তাদের মিলিত ভোট হল ৩৯.৪ শতাংশ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মিলিত ভোট ছিল ৩৯.৬ শতাংশ।

কিন্তু আসন সংখ্যার বিচারে যতটা বিরোধীরা আশা করেছিলেন সেই মতো ফলাফল হয়নি। ১৯৭১ সালের পরে এই রাজ্যে যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা সব সময় দুই তৃতীয়াংশ আসন সংখ্যা (১৯৭৭ সাল থেকে ২৯৪ আসনের মধ্যে অন্তত ১৯৬ আসন) নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু প্রকৃত বিরোধিতা কি কেবল আসন সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায়? বিধানসভার বাইরেও জনগণের নির্দিষ্ট ইস্যু ও দাবি নিয়ে মাঠে, ঘাটে ও রাস্তায় যে লড়াই করতে হয় সেটা ভুলে গেলে কি চলবে? বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি এবং শেয়ারবাজার ও বেটিং বাজারে তার কী প্রভাব থাকে, সেই নিয়ে কেউ গবেষণা করেন কিনা জানা নেই। একটা নির্বাচনের অনেকগুলো দিক নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সেই পর্যালোচনা আমাদের মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকে করতে পারিনি। কিছুটা আমাদের দুর্বলতা আর কিছুটা টেলিভিশন মিডিয়া-তে কথা বলার সময় কম পাওয়া, বা ঝগড়া বা তরজাতে জড়িয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু এই ফলাফল সম্পর্কে বিরোধী বা শাসক দল কেউ যে নিশ্চিত ছিলেন না তার কারণ হল, যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হারে দলগুলোর পরিধি বাড়ছে না। ফলে মানুষের পালস কিছুটা বুঝতে পারলেও কোনও দলের নেতৃত্ব খুব স্পষ্ট হতে পারেন না ঠিক কত আসন তারা পেতে চলেছে।

এ বার আসা যাক জোটের দিকে। জোট ও আসন সমঝোতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা মেনে নিয়েও আসল প্রশ্নটা করা হচ্ছে না কেন? আসন সমঝোতা ও জোট কি দুটো আলাদা দলের মধ্যে হবে, না এক রকম দলীয় রাজনীতির মধ্যে হবে যদিও দুটো দলের দুটো আলাদা নাম ও সাংগঠনিক কাঠামো আছে। অর্থাৎ কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট যদি আসন রফা করে তা হলে পশ্চিমবঙ্গে, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে কি কোনও গুণগত ফারাক থাকছে? অর্থাৎ বামফ্রন্ট তার নিজের শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বামপন্থী জনমোহিনী নীতির যে রাজনীতি করা উচিত ছিল সেটা কি আর করছে? তা যদি না করে থাকে তা হলে ভোটের রসায়নটা হবে কী করে? তা শুধু পাটিগণিতেই আটকে থাকবে।

> শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে কিছুটা এগোনো গেলেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় মানব উন্নয়নের নিরিখে এখনও যে একটা মধ্যম স্থান অধিকার করে আছে সেই ব্যর্থতা না বামফ্রন্ট, না তৃণমূল সরকার স্বীকার করছে। ভাবখানা এমন যেন, কিছুই খারাপ হয়নি।

এই রসায়নের কোনও শর্টকাট ফর্মুলা নেই। কিন্তু দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থা ফের অর্জন করতে গেলে বামেদের শুধু সাংগঠনিক কসরত করলেই চলবে না। সংগঠনকে চাঙ্গা করতে হলে আগে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চালু করতে গেলে বামেদের অন্তত পাঁচটা বিষয়ে মানুষের কাছে খোলা মনে ক্ষমা চাওয়া উচিত। প্রথমত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই কাণ্ডের ক্ষেত্রে পার্টি ভুল করেছিল এবং এই রকম ভুল কখনও হবে না সেইটা প্রকাশ্য জনসমক্ষে না বললে, যে গ্রামীণ জনতা, পার্টি থেকে দূরে সরে গেছে তারা আবার কেন ওই একই পার্টিকে ভোট দেবে? দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য পার্টি ডাক দেবে, কিন্তু আগের আমলের রাজনৈতিক হিংসা ও ক্ষেত্রবিশেষে রিগিং করা একটা পার্টিকে বৃহত্তর মানুষ কেন মেনে নেবেন? তৃতীয়ত, নাগরিক জীবনে পার্টির অযথা দখলদারি ঠিক হয়নি। চতুর্থত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে কিছুটা এগোনো গেলেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় মানব উন্নয়নের নিরিখে এখনও যে একটা মধ্যম স্থান অধিকার করে আছে সেই ব্যর্থতা না বামফ্রন্ট, না তৃণমূল সরকার স্বীকার করছে। ভাবখানা এমন যেন, কিছুই খারাপ হয়নি। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে টেলিভিশন দেখেন এমন সংখ্যার মানুষ, বিদ্যুৎ আছে এমন ঘর, ব্যাঙ্কে যান এমন মানুষ ও পরিস্রুত জলপান করেন এমন সংখ্যার মানুষ জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। ফলে কেবল টেলিভিশন-কেন্দ্রিক রাজনীতি এখনই খুব কাজে দেবে না। বামফ্রন্ট যদি খোলা মনে যা তারা করতে পেরেছিল (ভূমি-সংস্কার, পঞ্চায়েত, গরিব মানুষের গলার জোর, কয়েকটা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু প্রতিষ্ঠান বেড়ে ওঠা) আর যা তারা পারেনি সেগুলো বার বার জোরের সঙ্গে না বলে, একটা নির্বাচনে গিয়ে এর থেকে কি খুব ভালো ফল আশা করা যায়?

এবার আসা যাক, নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণি ও গোষ্ঠীর দিকে। সংখ্যালঘু বিষয়ে এক অভিজ্ঞ গবেষকের হিসেব অনুযায়ী ২০-৩০% মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটার আছে এমন আসনের সংখ্যা ৫০। ৩০-৪০% মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটার আছে এমন আসনের সংখ্যা ৩৩। ৪০-৫০% মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটার আছে এমন আসনের সংখ্যা ১৬। ৫০%-এর বেশি মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটার আছে এমন আসনের সংখ্যা ৪৬। সব মিলিয়ে ১৪৫। কিন্তু এক পরিশ্রমী রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে ২০%-এর বেশি সংখ্যালঘু মানুষ বসবাস করেন এমন আসনের সংখ্যা ১২৫। এই আসনগুলো কোন দিকে গেল বা সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস অপেক্ষাকৃত বেশি এমন জেলাগুলোর ফলাফল দেখে রাজনৈতিক ভূগোলের মাধ্যমে বড়ো জোর একটা প্রবণতা লক্ষ করে বলা যেতে পারে সংখ্যালঘু মানুষ কোন পার্টিকে বেশি ভোট দিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে এই কথা বলা যায় না যে সংখ্যালঘু মানুষ 'পাল' করে কোনও এক দিকে ভোট দিয়েছেন। সেই কথা বলতে গেলে দিল্লির সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটি (সিএসডিএস) এর নমুনা নির্ভর তথ্য অনেক বেশি কার্যকরী। সেই হিসেব অনুযায়ী গত এক দশকে বাম ও কংগ্রেসের সমর্থন সংখ্যালঘুদের মধ্যে কমেছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের সমর্থন উত্তরোত্তর বেড়েছে। সিএসডিএস এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৬ সালে তৃণমূলকে ২২% মুসলিম মানুষ সমর্থন করেছিল। আর ২০১৬ সালের এই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে ৫১% মুসলিম মানুষ সমর্থন করেছে। অন্য দিকে কংগ্রেসকে ১৪%, বামেদের ২৪% আর বিজেপিকে ৬% মুসলিম মানুষ সমর্থন করেছে। বাম ও কংগ্রেসকে একসঙ্গে যোগ করলে সেই জোটের প্রতি ৩৮% মুসলিম মানুষ সমর্থন করেছে। তাই সংখ্যালঘু মানুষ 'পাল' করে এক দিকে ভোট দেয় সেটা একটা ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা।

গত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সিএসডিএস-এর করা জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে পরিষ্কার যে গ্রামীণ খেতমজুর, গ্রামীণ দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক এবং যে কৃষক জমির মালিক এমন অংশের মধ্যে তৃণমূলের সমর্থন ছিল যথাক্রমে ৩৩%, ৩৪% আর ৪১% আর অন্য দিকে বামেদের পক্ষে ওই সমস্ত শ্রেণির মানুষের সমর্থন ছিল যথাক্রমে ৩৩%, ৪৩% এবং ৩২%। শহরের ভোটারদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও মাসিক মাইনে পাওয়া মানুষের মধ্যে বামেদের সমর্থন একটু বেশি হলেও খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে শহুরে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে তৃণমূলের সমর্থন ৩৬%, বিজেপির ৩১%, বামেদের ১৭% ও কংগ্রেসের ১২% মানুষের সমর্থন ছিল। ওই হিসেবের উপর নজর দিয়ে গত দু'বছরে বামেদের কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর সমিতির গ্রামীণ মানুষের জন্য যে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন দরকার ছিল সেই লড়াই কি হয়েছিল? ২০০৬ সালে বামেরা স্লোগান দিয়েছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। গত এক দশকে কৃষির ভিত্তি নড়বড়ে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ও গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ শহরে কাজ করার জন্য অভিপ্রয়াণ থেকে পরিষ্কার যে রাজ্যে একটা কৃষি সংকট চলছে। শাসকদল বিভিন্ন অনুদানের মধ্যে গ্রামীণ জনতাকে কোনও রকম সামলে রেখেছে। রাজনীতির গতিপ্রকৃতির মতোই এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়।

পশ্চিমবঙ্গে কারখানা কম। অনেক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তাতে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা আরও বাড়ছে। এই ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের সংখ্যা সর্বমোট শ্রমিকের ৯৪ শতাংশ। বামেদের চিরকাল কৃষক ও কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন থাকলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা কম। রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক রণকৌশলের উপর নির্ভর করে। এই বাস্তব কথাটি ভুলে গেলে রাজনীতিবিদ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সবার হিসেবই ভুল হবে।

এই নির্বাচনে শাসক দল গত পাঁচ বছরে কী কাজ করেছিল সেই নিয়েই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার ছিল। সেই বিজ্ঞাপনের মতো একটা ইস্তেহারে আগামী পাঁচ বছরে তারা নতুন কী কাজ করবে সেই বিষয়ে বক্তব্য স্পষ্ট ছিল না। অন্য দিকে বিরোধীদের স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ইস্তেহার ছিল। কিন্তু তারা নেতিবাচক প্রচারের সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে ইতিবাচক কী কাজ করবে সেটা জনগণের কাছে খুব পরিষ্কার করে বলার ক্ষেত্রে অনেক খামতি ছিল। বিরোধী দলের অনেক নেতা নেত্রীরা শুধু ফেসবুক ও মিডিয়া (ভার্চুয়াল জগৎ)-তে থাকবেন আর পাঁচ বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে বাস্তব জগতের সঙ্গে জনসংযোগ না রাখলে খুব ভালো ফল আশা করা কি বাস্তবসম্মত?

পরিণামপর্ব
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক